সদ্যবিদায়ী জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কমিশনারদের খোলা চিঠি

সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশগুলো সংসদে পাস না হওয়ায়, ভুক্তভোগীরা আমাদের বারবার প্রশ্ন করছেন, *"এখন আমাদের কী হবে?"* তাঁদের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকেই এই খোলা চিঠি।

আমরা পাঁচজন সদ্যবিদায়ী মানবাধিকার কমিশনার। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে আমাদের কর্মজীবন মানবাধিকার সুরক্ষায় নিবেদিত ছিল। এই দীর্ঘ অভিজ্ঞতার দরুন, ভুক্তভোগীদের বেদনা, আইন প্রয়োগকারীদের দৈনন্দিন প্রতিকূলতা এবং আইনাঙ্গনের জটিলতার সাথে আমরা সুপরিচিত। তাই কোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিস্বার্থে নয়, ভুক্তভোগীদের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকে আজ আমরা কলম হাতে নিয়েছি।

চিঠির তিনটি অংশ: সংসদে উপস্থাপিত ভুল তথ্যের জবাব, অধ্যাদেশগুলোর বিরুদ্ধে সরকারের প্রকৃত আপত্তি চিহ্নিতকরণ, এবং ভবিষ্যৎ আইনের গুণগত মান বিচারের প্রস্তাবনা।

সংসদে উপস্থাপিত ভুল তথ্যের জবাব

অধ্যাদেশগুলো বাতিলের পক্ষে যুক্তি হিসেবে সংসদে বেশ কিছু ভুল তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে; নিচে সঠিক তথ্য দেওয়া হল। তবে শুরুতেই স্পষ্ট করা দরকার যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশ হল প্রিন্সিপাল আইন; এর ওপরই দাঁড়িয়ে গুম প্রতিরোধ ও প্রতিকার অধ্যাদেশ এবং জুলাই গণঅভ্যুত্থান সুরক্ষা ও দায় নির্ধারণ অধ্যাদেশ। সুতরাং নিম্নোক্ত আলোচনা অঙ্গাঙ্গিভাবে-যুক্ত এই তিনটি অধ্যাদেশ নিয়েই।

১। সংসদে বলা হয়েছে: গুমের সাজা মাত্র ১০ বছর, যা ভুক্তভোগীদের জন্য অবিচার।

বাস্তবে: গুম অধ্যাদেশে অপরাধের মাত্রাভেদে সর্বোচ্চ সাজা মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন সহ যেকোনো মেয়াদের কারাদণ্ড, এবং জরিমানা (ধারা ৪(১)-(২))।

২। সংসদে বলা হয়েছে: অধ্যাদেশে তদন্তের সময়সীমা নেই; জরিমানা নির্ধারণের ও আদায়ের উপায় নেই।

বাস্তবে: মানবাধিকার কমিশন অধ্যাদেশে তদন্তের সময়সীমা স্পষ্ট বেঁধে দেওয়া আছে (ধারা ১৬(১)(ঙ)-(চ)) এবং জরিমানা নির্ধারণ ও আদায়ের পদ্ধতি বিস্তারিত আছে (ধারা ২৩)। এমনকি সময়মতো তদন্ত রিপোর্ট দাখিল না করলে গুম অধ্যাদেশে শাস্তির বিধানও আছে (ধারা ৮(৫))।
বরং সংসদ কর্তৃক পুনর্বহালকৃত ২০০৯-এর মানবাধিকার কমিশন আইনে এগুলো কিছুই নেই।

৩। সংসদে বলা হয়েছে: আইসিটি আইন যথেষ্ট। মানবাধিকার কমিশন এবং গুম অধ্যাদেশ "বালখিল্যতা" মাত্র। গুম অধ্যাদেশ আইসিটি আইনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক।

বাস্তবে: আইসিটি আইন কেবল মানবতাবিরোধী অপরাধ বিচার করতে পারে, ফৌজদারি অপরাধ নয় (ধারা ৩(২)(এ))। কোনো অপরাধ মানবতাবিরোধী হিসেবে গণ্য হতে হলে তা ব্যাপক/পদ্ধতিগত হতে হয়, অনেকটা হত্যা আর গণহত্যার পার্থক্যের মতো। তাই আইসিটি 'বিচ্ছিন্ন' গুমের বিচার করতে পারে না, শুধু 'গণহারে' গুমের বিচার করতে পারে। সংসদে বলা হচ্ছে আইনে এ বিষয়ে "এমবিগুইটি" আছে, যা

সঠিক নয়। গুম অধ্যাদেশও বলে যে ব্যাপক/পদ্ধতিগত গুমের বিচার আইসিটির এখতিয়ারাধীন (ধারা ২৮)। সংসদে বলা হয়েছে দুটো আইন "ম্যাচিং" করার উদ্দেশ্যে অধ্যাদেশ বাতিল হয়েছে। যেহেতু 'বিচ্ছিন্ন গুম' আর 'গণহারে গুম' ভিন্ন অপরাধ, আইন "ম্যাচিং" করার কোনো অবকাশ নেই।

এদিকে সংসদ কর্তৃক অধ্যাদেশটি বাতিল হওয়ার কারণে, ১১ এপ্রিল থেকে কোনো নতুন গুম হলে সেটি ফৌজদারি আইনেও সংজ্ঞায়িত নয় এবং আইসিটিতে গেলেও ভুক্তভোগীরা কোনো প্রতিকার পাবেন না।

৪। সংসদে বলা হয়েছে: অধ্যাদেশ পাসের মাধ্যমে জুলাই যোদ্ধাদের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

বাস্তবে: জুলাই অধ্যাদেশ অনুযায়ী, অভ্যুত্থানকালে রাজনৈতিক প্রতিরোধের কারণে মৃত্যু হলে, জুলাই যোদ্ধারা সুরক্ষিত থাকবেন; তবে বিশৃঙ্খলার সুযোগে সংঘটিত হত্যা হলে, মামলা হবে (ধারা ৫)। স্বার্থের দ্বন্দ্ব এড়াতে, কোন মৃত্যু কোন শ্রেণিতে পড়বে তা মানবাধিকার কমিশন তদন্তের মাধ্যমে নির্ধারণ করবে। কিন্তু পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে, মানবাধিকার কমিশন নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের তদন্ত করতে পারবে না (ধারা ১৮)। তদন্ত করবে সেই সরকারি বাহিনীগুলোই, যারা জুলাইয়ে নিজেরাই সরাসরি পক্ষ ছিল। যে তরুণ রাস্তায় নেমেছিলেন, তাঁর ভাগ্য নির্ধারণ করবেন তিনিই, যাঁর বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন। ***ফলে ভবিষ্যতে সব রাজনৈতিক দলের জুলাই যোদ্ধারাই ঝুঁকিতে পড়তে পারেন।***

৫। সংসদে বলা হয়েছে: কমিশন তদন্ত করে আবার নিজেই বাদী হয়ে মামলা করা পক্ষপাতমূলক।

বাস্তবে: কোনো অভিযোগ আপস-অযোগ্য ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে প্রতীয়মান হলে, কমিশনের মামলা করার সুযোগ আছে। স্বার্থের দ্বন্দ্ব কেবল তখনই হতো, যদি কমিশন সেই মামলায় বিচারকের ভূমিকাও পালন করত, যা অধ্যাদেশে নেই। তদন্তকারী পুলিশও নিয়মিত বাদী হয়ে মামলা করে, কেউ সেটাকে পক্ষপাতমূলক বলে না।

৬। সংসদে বলা হয়েছে: ২০০৯/২০২৫ উভয় আইনেই কমিশন স্বায়ত্তশাসিত, তাই দুটিই সমান শক্তিশালী।

বাস্তবে: পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে কমিশন নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করতে পারে না (ধারা ১৮), কিন্তু ২০২৫ অধ্যাদেশে পারত। অতএব স্বায়ত্তশাসন মানেই কার্যকর ক্ষমতা থাকা নয়।

অধ্যাদেশগুলোর বিরুদ্ধে সরকারের প্রকৃত আপত্তিসমূহ

সংসদীয় বিশেষ কমিটির প্রতিবেদনে সরকারের প্রকৃত আপত্তিগুলো নথিভুক্ত আছে। আপত্তিসমূহের মূলে একটাই নীতি: মানবাধিকার কমিশনের আইনগত স্বাধীনতা খর্ব করা।

প্রথম, কমিশনকে মন্ত্রণালয়ের অধীন রাখার দাবি। এটি কমিশনের প্রাতিষ্ঠানিক স্বাধীনতার পরিপন্থী। অধ্যাদেশ অনুযায়ী কমিশনকে জবাবদিহি করতে হতো রাষ্ট্রপতি, প্রধান বিচারপতি, অডিটর জেনারেল এবং নাগরিক সমাজের কাছে। পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে কমিশন আবার কার্যত আইন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ফিরেছে।

দ্বিতীয়, নিরাপত্তা বাহিনীর তদন্তে সরকারের পূর্বানুমতির দাবি। বিগত পনেরো বছরে গুম, নির্যাতন ও বিচারবহির্ভূত হত্যার প্রায় সব অভিযোগই ছিল সরকারি বাহিনীর বিরুদ্ধে। সরকারি প্রতিষ্ঠান অভিযুক্ত হলে,

সরকারেরই অনুমতিক্রমে তদন্ত অর্থহীন। পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে কমিশনের এই স্বাধীন তদন্তক্ষমতা আর নেই (ধারা ১৮)।

তৃতীয়, সরকার জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে আটককে গুমের সংজ্ঞা থেকে বাদ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৩৩(২) মোতাবেক গুমের সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েছিল; যে কারণেই আটক হোক, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আদালতে হাজির করলেই সেটা গুম নয়। আইনে সংবিধানের বাধ্যবাধকতা এড়ানো অসম্ভব।

চতুর্থ, বাছাই কমিটিতে আরও সরকারি প্রতিনিধিত্বের দাবি। ২০২৫ অধ্যাদেশে বাছাই কমিটির ৫০% নির্বাহী-ঘনিষ্ঠ ছিল। পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আইনমন্ত্রীকে অন্তর্ভুক্তকরণসহ বাছাই কমিটির ৬০% নির্বাহী-ঘনিষ্ঠ। এতে করে কমিশনার নিয়োগে, পূর্বের ন্যায়, দলীয়করণের সুযোগ ফিরল।

ভবিষ্যৎ আইনের গুণগত মান বিচারের প্রস্তাবনা

এই আলোচনায় বোঝা যায় যে সরকারের অবস্থানে একটি মৌলিক অন্তর্দ্বন্দ্ব আছে। একদিকে বলা হচ্ছে, যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী আইন প্রণীত হবে। অন্যদিকে বিশেষ সংসদীয় কমিটি কর্তৃক নথিভুক্ত সরকারের প্রকৃত আপত্তিগুলো মানলে, অনিবার্যভাবে পুনর্বহালকৃত ২০০৯ আইনের মত দুর্বল আইন তৈরি হবে, যা জন্মলগ্ন থেকে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ।

নিঃসন্দেহে অধিকতর পরামর্শ বাঞ্ছনীয়। তবে পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট অধ্যাদেশ প্রণয়নের আগে ৬০০-এরও অধিক অংশীজন পরামর্শ প্রক্রিয়ায় যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে শীর্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারাও ছিলেন; বর্তমান আইনমন্ত্রীও ছিলেন। সে ক্ষেত্রে অধ্যাদেশ বাতিল হতে না দিয়েও, গুমের সংজ্ঞা বিলুপ্ত করে আইনি শূন্যতা তৈরি না করেও, এবং ২০০৯ সালের দুর্বল আইন পুনর্বহাল না করেও, পরামর্শের ভিত্তিতে পরে সংশোধনের পথ খোলা ছিল।

এদিকে গুম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সনদ ICPPED-তে স্বাক্ষর করায়, গুমকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে সংশ্লিষ্ট আইন প্রণয়ন করতে রাষ্ট্র বাধ্য (অনুচ্ছেদ ৪(১))। **সুতরাং ভবিষ্যতে সরকার যদি নতুন আইন প্রস্তাব করেও, ভুক্তভোগীরা একটি বিষয়েই নজর রাখবে:** সরকারের নথিভুক্ত আপত্তিগুলো মেনে নিয়ে কি আইনকে দুর্বল করা হচ্ছে, নাকি সেই আপত্তিগুলো প্রত্যাখ্যান করে অধ্যাদেশগুলোর চেয়েও শক্তিশালী আইন আনা হচ্ছে?

যে পরিবারগুলো এখনও দরজায় কান পেতে আছে, তাঁরা বহু অমূলক আশ্বাস শুনেছে। *"এখন আমাদের কী হবে?"* এই প্রশ্নের জবাব মুখের কথায় নয়, দিতে হবে শক্তিশালী ও কার্যকর আইন প্রণয়নের মাধ্যমে।

বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী

মো. নূর খান

ইলিরা দেওয়ান

অধ্যাপক মো. শরীফুল ইসলাম

ড. নাবিলা ইদ্রিস